মানুষ ও মারি

সম্পাদনা

সুশান্ত পাল

পুনশ্চ

সূচিপত্র

'মারী নিয়ে ঘর করি ...'		০৯
অতিমারি কোভিড-১৯ **বিজ্ঞান-জনগণ-রাষ্ট্র বিকল্প**		
ভাইরাস নয়, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিপর্যয়েই বিভীষিকা	ডা. অরুণ সিং	১৩
অসাম্যের নতুন হাতিয়ার : লকডাউন	ডা. স্থবির দাশগুপ্ত	১৮
ভ্যাক্সিন-জাতীয়তাবাদ, রাষ্ট্র এবং জকোভিচের ঘটনা	ডা. জয়ন্ত ভট্টাচার্য	২৫
করোনায় রাষ্ট্র ও ভারতীয় মন	ডা. গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়	৪১
ভারতের মানবিকতাহীন মুনাফাসর্বস্ব টিকানির্মাতাগণ	অপর্ণা গোপালন	৪৫
তৃতীয় তরঙ্গ	শমীক লাহিড়ী	৫৭
কেন এই দ্বিধা? কেন এই অনীহা?	অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী	৬৩
শিক্ষার লকডাউন	অনিন্দিতা ভদ্র	৬৮
অতিমারি পরিস্থিতিতে আক্রান্ত শিক্ষা, বিপন্ন শিক্ষার্থী	দেবাশিস মল্লিক	৭৫
কোভিড-১৯ : অ আ ক খ	অভীক ভট্টাচার্য	৮০
কোভিডকালে নারীর যন্ত্রণা	অঙ্গিরাপ্রিয়া নন্দী	৮৭
করোনা ভাইরাসের অন্য গল্প	স্নেহাশিস গুহ	১০০
সময় থমকে দাঁড়িয়ে	শুভাশিস ভট্টাচার্য	১০৫
শিক্ষার্থীর ভাবনায় অনলাইন পঠন-পাঠন ও নতুন শিক্ষানীতি	প্রীতি দে, অদ্রিজা কারক	১১২
লড়াই জারি আছে	সানিয়া নাসরিন	১১৮

কমিউনিটি কিচেন থেকে রেড ভলান্টিয়ার্স : একটি সোভিয়েত উত্তরাধিকার	অর্ক রাজপণ্ডিত	১২৩
শ্রমজীবী ক্যান্টিন : যে দায়িত্ব রাষ্ট্র নেয়নি	বুদ্ধদেব ঘোষ	১২৮
ডক্টরস্ ফোরামের টেলি-মেডিসিন উদ্যোগ		১৩০
কোভিড বিধিনিষেধ প্রত্যাহারে নাগরিক সমাজের আবেদন		১৩১
কোভিড অতিমারি ও রামকৃষ্ণ মিশন	স্বামী পুরহরানন্দ	১৩৩
কোভিড-১৯ : বৈষম্যের অতিমারি ভারতের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা		১৩৭

ইতিহাস—উপনিবেশ—নগরায়ন—আর্থ-রাজনীতি

ইতিহাসের আলোকে মহামারি ও অতিমারি	সুদীপ্ত ভট্টাচার্য্য	১৪৩
মহামারি, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও দেশীয় জনগণ	সৌম্য মুখোপাধ্যায়	১৬৭
ভ্যাক্সিন ও দ্বিধা—সমান্তরাল অভিযান	কঙ্ক ঘোষ	১৭৪

অকালে আঁকাআঁকি

মুখ	রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায়	১৮৪

কতশত মারি

ক্ষুধার বিশ্বে ভারতবর্ষ	সহদেব	১৮৭
মারির নাম অসহিষ্ণুতা	পার্থ সারথি বণিক	১৯২
সংঘবদ্ধতার বিচ্ছিন্নতা : বিচ্ছিন্নতার একাকিত্ব	অমৃতেশ বিশ্বাস	১৯৬
কী কি লিখছি পড়ছি কী কি?	সুশান্ত পাল	২১০

কথা-কাব্য-কবিতায় মারি

দেশ-দেশান্তরের কথাসাহিত্যে মহামারি-অতিমারি	সঞ্জীব দাস	২১৫
কবিতায় করোনাকালের ছায়া	ঋতম্ মুখোপাধ্যায়	২৩৮
মহামারি ও শীতলামঙ্গল : একটি আলোচনা	রাহুল মল্ল	২৪৭
লেখক পরিচিতি		২৫৭

‘মারী নিয়ে ঘর করি ...’

কোভিডময় নিউ নর্ম্যালে পৌঁছে আমাদের কি মৃত্যুপরিকীর্ণ ওই দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে? চালডাল মজুত করছি। শস্য আনাজপাতি ডিম যত পারো ভরো। ডবল ডোর তিনশত পঁয়তাল্লিশ লিটার রেফ্রিজারেটর হার মানছে। আরও কয়টির অভাব অনুভূত হচ্ছে। ওয়ারড্রব-এর কয়েকটি গুদামে রূপান্তরিত। যত পারো ভরো। লিকার চা আর ফরেন লিকার।

আপনি আমি সবাই গরম জল সহযোগে টিভি গিলছি। ফেসবুক উঅটস্অ্যাপে কত কী যে জানছি! শব্দে জব্দ করোনা। ম্যাজিক পিল ক্লোরোক্যুইন। আইভারমেক্টিন ফর্মুলায় কুপোকাত করোনা। বহুরূপী করোনা। সকাল বিকাল রাতে সুগার প্রেসার হার্টে করোনা করোনা করোনা। টম হ্যাঙ্কসের করোনা। বরিস জনসনের করোনা। পাড়ার মেয়ে মিতিন মাসির অথবা বলি নায়িকার পিতৃদেবের। হাঁচিতে কাশিতে হাসিতে করোনা। ‘হাতশুদ্ধি’ শব্দ সৃজনে করোনা। হলুদ দুধ লেবুর জল। মোবাইলে মোবাইলে ইমিউনিটি ঢল। আমরা তখন অমুক বাবু তমুক দেশ। দেবী শেঠি থেকে হু প্রধান ট্রেডস।

জেনে ফেলেছি কোয়ারান্টিন। আইসোলেশন বাসে এই বেশ ভালো আছি। কাজের মাসি বস্তিবাসীর করোনা-কে হেলায় দেখানো বুড়ো আঙুল দেখে ফেলেছি। দেখছি কোভিডে মনুষ্যেতরে যেন গাদাগাদি ঠাসাঠাসি। শিউরে উঠছি অজ্ঞানতায়। স্ফীত গর্বে হতাশায় স্বগতোক্তি করছি—এদেশের কিচ্ছুটি হবে না—যে সিদ্ধান্তে বারবার শ্লাঘা অনুভব করেছি। আমলা পুত্র ছেড়ে পরিযায়ী হাঙ্গামায় যারপরনাই বিরক্ত হয়ে বলছি, গোটা দেশটাকেই কোয়ারান্টিনে পাঠানো উচিত। দরজা-জানালা বন্ধ। সাবধান বাতাসে ভাসছে করোনা। চোপ্-র যত পরিযায়ী বজ্জাত, চাঁদের আলোয় ঘর ফিরিস! চোখের মাথা খেয়েছিস। দেখছিস না লকডাউন চলছে। পাঁচ শতাংশ সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট গায়ে মেখে আগে বীজাণু মুক্ত হ।

এখনও বিশ্ব কোভিডময়। বারে বারে রাষ্ট্রনায়কের জুজু—ফিরে এসো লকডাউন। কর্মজীবী মানুষ পুনরায় ঘর ছেড়েছে। কৃষক শ্রমিক বেকার সাধারণ মানুষ অভুক্ত। ওদের যূপকাঠে চড়ান, না হলে ভাত চাইবেই। আপনি আমি যদি রসেবশে শুয়ে-বসে থাকি আর ওদের সানকি ভাত শূন্য, তবে শুনতেই পারেন ওদের চিৎকার—

"গাছপালা; নদী-নালা
গ্রাম-গঞ্জ, ফুটপাত, নর্দমার জলের প্রপাত
চলাচলকারী পথচারী, নিতম্ব প্রধান নারী
উড্ডীন পতাকাসহ খাদ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীর গাড়ি
আমার ক্ষুধার কাছে কিছুই ফেলনা নয় আজ ..."

আপনার-আমার অধ্যাপক মশাই ওদের প্রলাপ শুনে বলতেই পারেন — "Can the Subaltern Speak ?" প্রত্যুত্তরে ধরুন অসভ্য হাভাতে কাঙাল লক্ষ লক্ষ ড্রপলেট আপনার আমার মুখে ছিটিয়ে দিল—

"ভাত দে হারামজাদা,
তা না হলে মানচিত্র খাবো।"

পালানোর পথ পাব?

হয়তো সে অনেক পরের কথা। তারচেয়ে এখন ঘুরে দেখি সেই আতঙ্ক উন্মাদনা স্বার্থপরতার দিনগুলি। নাও দেখতে পারি। কিছু কিছু দেখা আর শোনার স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত তো আমাদের। কেমন ছিলাম আমরা? আমাদের স্বদেশ? আমি ও আমাদের মন?

মন ভালো নেই আমাদের পৃথিবীর। গভীর কালো অসুখ বাসা বেঁধেছে শরীরে। সারি সারি মৃত্যু। ঘনীভূত সন্দেহ পারস্পরিক দোষারোপ। অস্পৃশ্যতার একবিংশ শতকীয় সংস্করণ। ভাত নেই। কাজ নেই। হাসি নেই। গান নেই। অথচ ভোট আছে। কতশত ভাতা আছে। নাগা সন্ন্যাসীর পুণ্যার্জিত ডুব আছে। অক্সিজেন অ্যাম্বুলেন্স বেড নেই। কচিকাঁচার মন ভালো নেই। চোখে জল। সেই কবে যে বেজেছে ছুটির ঘণ্টা।

এই সেদিনও তাঁরা ছিলেন যাঁদের থাকার কথা ছিল এখনও। উদ্বৃত্ত হয়ে চলে গেলেন। বেপরোয়া কারা যেন জীবনটাকে তুচ্ছ মনে করে সামনে থেকে সাহস দেখাল। হার মানল। জানলই না অনেকে ফুরানোর তার সময় ছিল না আদৌ। অনিঃশেষ প্রতীক্ষায় রয়ে গেল অগণিত। যাওয়ার কথা ছিল না তাদের। আগামীতে হাতে হাত রাখত। মাথার চুলে বিলি কাটতে কাটতে কখন যে দুটো গাল ধরে আদর করত।

'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে!' এই সময়কালে দূরত্বের স্ব-আরোপিত গণ্ডি কাটিয়ে উঠতে পারব কি আমরা? বহুদিনের এই অনুশীলন সাম্প্রতিক social distancing চর্চায় বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞায় নিষিক্ত, পৃক্ত হয়েছে। মুখোশটাও মানানসই। লেয়ার বেড়েছে তিন চার পাঁচ। মাস্কে ডিসটেন্সে কম-প্যাক্ট অ্যালিয়েনেশন।

এই সময়, মানুষের অসহায়তা, লড়াই, জীবনের যাবতীয় ঘটনাক্রম সংরক্ষণ করার তাগিদে, সর্বগ্রাসী বিস্মৃতির সংক্রমণের বিপরীতে প্রকাশ হয়েছে অভিক্ষেপ-এর 'মানুষ ও মারি' সংখ্যা। পত্রিকার প্রকাশকাল ছিল জুলাই, ২০২১। প্রবন্ধগুলি পাঠক পড়বেন সেই সময়ের প্রেক্ষিতে।

প্রথমে আশার কথা। রাষ্ট্র যখন নিজেদের দায়িত্ব প্রতিদিন সংকুচিত করছে, তখন বিভিন্ন সংগঠন নিজেদের মতো করে অসহায় মানুষের পাশে ছিল, আছে। শ্রমজীবী ক্যান্টিন, রেড ভলান্টিয়ার, ডক্টরস্ ফোরাম, নাগরিক সমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন ও অগণিত ব্যক্তি ও সমষ্টির বিকল্প উদ্যোগের ইতিবৃত্ত আমরা জানতে চেয়েছি। বুঝতে চেয়েছি কোভিড, মানুষ, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি, রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক। অতীত থেকে মারির ইতিহাস, করোনা ভাইরাসের অ-আ-ক-খ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিপর্যয়, টিকা গুজব-মুনাফার ওতপ্রোত সংযোগ, শিক্ষায় লকডাউনের প্রভাব, ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষকের ভাবনায় অনলাইন পঠন-পাঠন, গৃহবন্দি নারীর যন্ত্রণা, কাজ হারানো ও থাকার বিপন্নতা এবং আর্থ-মানস অন্যোন্যতা। মারি, তার বিস্তার ও নিয়ন্ত্রণে ঔপনিবেশিকতা, আধুনিক নগরায়ন ও রাষ্ট্রের ভূমিকা। এবং দেশ-দেশান্তরের কথাসাহিত্যে, আমাদের মঙ্গলকাব্যে, করোনা-কালের কবিতায় মারি প্রসঙ্গ। মানুষের মননে, বিশ্বাসে, জীবনে মারির সুদূরপ্রসারী ফলাফল অনুধাবন করতে চেয়েছি আমরা।

পাশাপাশি আরও কতশত মারিতে আক্রান্ত আমরা, আবহমান। ক্ষুধা, অসাম্য, অসহিষ্ণুতা, ধর্মান্ধতা, বিচ্ছিন্নতা, উগ্রজাতীয়তাবাদ, মৌলবাদ ... আরও কত কী! বিশ্বায়ন, সোশ্যাল মিডিয়ায় আত্মরতি, অ-রাজনীতি, অপ-সংস্কৃতি, অপ-বিজ্ঞানের সামাজিক সংক্রমণ। যোগাযোগ-সংযোগের ভারসাম্য হারিয়েছি। আগামী ভবিষ্যতে আমরা জয় করব করোনাকালীন পরিস্থিতি, ভাইরাসের বিরুদ্ধে গড়ে উঠবে হার্ড-ইমিউনিটি, নিশ্চিত।

কিন্তু মানসিক স্থবিরতা, বৈষম্যের অতিমারি থেকে নিষ্কৃতি কোথায়, কীভাবে? সমাধান অন্বেষণ জরুরি।

কৃতজ্ঞতা শ্রী সন্দীপ নায়ক-কে। পুনরায় সাহস জোগালেন অভিক্ষেপ-কে, 'মানুষ ও মারি' সংকলন প্রকাশ করে। অনিবার এ পথ চলা।

পয়লা বৈশাখ, ১৪২৯

সুশান্ত পাল

ভাইরাস নয়, স্বাস্থ্যব্যবস্থার বিপর্যয়েই বিভীষিকা

ডা. অরুণ সিং

করোনা ভাইরাস সার্স কোভ-২, তার সঙ্গে মানুষের প্রথম পরিচয় চিনের উহানে, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দেই। আমরা কিন্তু ২০২০-র ফেব্রুয়ারির শেষ, এমনকি মার্চের একটা পর্ব পর্যন্ত তা নিয়ে যথেষ্ট ভাবিনি। ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখব, ২০০২ খ্রিস্টাব্দে চিনে যে সার্স ভাইরাস পাওয়া গিয়েছিল, তার সঙ্গে সার্স কোভ-২ ভাইরাসের ৯০ শতাংশ মিল রয়েছে। তখন সেই ভাইরাস ২৬টির বেশি দেশে ছড়ায়নি। মৃত্যুহার এই নতুন ভাইরাসের থেকেও অনেক বেশি ছিল, প্রায় ১০ শতাংশ। সংক্রামিতদের মধ্যে কতজন মৃত, সেই অনুপাত নিয়ে মৃত্যুহার হিসাব করা হয়।

মিল রয়েছে আরও। প্রথমবারেও দেখা গিয়েছিল আক্রান্ত হচ্ছেন মুখ্যত বয়স্করা। শিশুদের বিশেষ সমস্যা হচ্ছে না। আক্রান্তদের অনেকের মধ্যে ফুসফুসের সংক্রমণ দেখা গিয়েছিল। অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ কাজ দিচ্ছিল না, প্রয়োগ করতে হয়েছিল স্টেরয়েড। ভাইরাস শরীর থেকে চলে যাওয়ার পরেও অনেকেই সাইটোকাইন ঝড়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন। শরীরের আত্মরক্ষার নিজের অস্ত্র সাইটোকাইন-ই আত্মঘাতী হয়ে দাঁড়াচ্ছিল তখনও। ১৮ বছর আগেই এই তথ্য ছিল। সার্স কোভ-২ ভাইরাসের মৃত্যু হার কিন্তু অনেক কম হল। মিউটেশন করে নতুন ভাইরাস অনেক বেশি ছোঁয়াচে হল। সংক্রমণ ক্ষমতার কারণে অনেক বেশি দেশে ছড়িয়ে গেল দ্রুত। এখানেও সেই শ্বাসের কষ্ট। স্বাভাবিক শরীরে মিনিটে ৩০ বার নিশ্বাস নিতে হয়। এখানে তার বেশি নেওয়ার চেষ্টা করতে হয়, কারণ অক্সিজেন ফুসফুসে কম ঢুকছে। যাঁদের সংকট বেশি, তাঁদের অক্সিজেন ও অল্প একটি অংশের আইসিইউ দরকার হয়।

ভাইরাসের সংক্রমণে মহামারির দুটি দিক বিচার করতে হয়। এক, তার সংক্রমণ ক্ষমতা। দুই, কতটা প্রাণঘাতী। শঙ্কা হয়, সংক্রামিত হলেই কি মরে যাব? সেক্ষেত্রে গুরুতর চিকিৎসার ব্যবস্থা কতজনের জন্য করতে হবে বিচারে রাখতে হয়। আমাদের দেশে সংক্রমণের প্রথম এবং দ্বিতীয় তরঙ্গের তুলনা করব। সংক্রমণে এমন নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি হওয়া নতুন কিছু নয়। জনসংখ্যার সত্তর শতাংশ বা তার বেশি সংক্রামিত

হয়ে থাকলে নতুন তরঙ্গ সাধারণত হয় না। না হলে প্রথমবার যিনি সংক্রামিত হননি, দ্বিতীয়বার হতেই পারেন। যেমন, আমাদের দেশে তৃতীয় তরঙ্গের সম্ভাবনা রয়েছে। এখনও পর্যন্ত আমাদের যে অভিজ্ঞতা তার ভিত্তিতেই প্রস্তুতি নিতে হবে।

প্রথমেই বলা দরকার যে, দ্বিতীয় তরঙ্গের বিভিন্ন কারণ রয়েছে। মিউটেশন হওয়ায় ভাইরাসের বিভিন্ন প্রকরণ এ দেশে ঢুকেছে। কিন্তু প্রথম তরঙ্গের তুলনায় দ্বিতীয় তরঙ্গে ভাইরাস বেশি প্রাণঘাতী, এই ধারণার কোনও বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ নেই। দ্বিতীয় তরঙ্গে প্রকরণের সংক্রমণ ক্ষমতা বেশি। সংক্রামিত হয়েছেন অনেক বেশি মানুষ, ফলে মোট মৃত্যুর সংখ্যাও বেড়েছে। আমাদের প্রস্তুতি থাকলে বহু মৃত্যু ঠেকানো যেত। ভাইরাস নয়, দ্বিতীয় তরঙ্গে এত মৃত্যুর কারণ স্বাস্থ্যব্যবস্থার বিপর্যয়।

কেমন বিপর্যয়? আমরা দেখেছি প্রয়োজনের তুলনায় হাসপাতালের বেড নগণ্য, অক্সিজেন দেওয়া যাচ্ছে না। একসঙ্গে বহু মানুষ আক্রান্ত। দেখা গেল, প্রশাসনিক স্তরে পরামর্শ দেওয়ার কেউ নেই, কোনও নজরদারির ব্যবস্থাই নেই। পুরো ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা। তার জন্যই এত প্রাণহানি। অথচ প্রথমবারের তরঙ্গ মোকাবিলার অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় তরঙ্গের জন্য প্রস্তুতিই নেওয়া হল না। দ্বিতীয় তরঙ্গে ভাইরাস কিন্তু বেশি প্রাণঘাতী নয়। আমাদের পর্যাপ্ত বেড ও অক্সিজেন থাকলে আগের বারের তুলনায় মৃত্যু কম হত।

প্রস্তুতি বলতে কী বোঝাচ্ছে? ভারতের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে বড়ো বড়ো হাসপাতালমুখী করে দেওয়া হয়েছে। এলাকা ভাগ করে ছোটো ছোটো আধুনিক হাসপাতাল করার সুপারিশ ছিল 'ভোর কমিটি'-র। কিন্তু বাজারিকরণের পিছনে ছুটে তা অমান্য করা হয়েছে। এক-একটি শহরে পাঁচতারা হাসপাতাল তৈরির পিছনে ছোটা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার মেরুদণ্ড একাধিক স্তর বিশিষ্ট চিকিৎসা পরিকাঠামো। জনস্বাস্থ্যে উন্নতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো তৈরি না করার ফল ভুগতে হচ্ছে। বারবার প্রমাণিত যে, জনস্বাস্থ্যর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পরিচালিত হলে মহামারি পরিস্থিতিতে মৃত্যুহার কমে। তার মানে কী? মানে হল, এলাকায় এলাকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকবে। যেখানে মিলবে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, নার্স। মিলবে অক্সিজেন বা সেই স্তরে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। সেই ব্যবস্থা থাকলে যত মৃত্যু হয়েছে, তার ভগ্নাংশ হত। আমাদের অস্ত্র ছিল, অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু,মোকাবিলার ব্যবস্থাপনা ছিল না। শহরকেন্দ্রিক ব্যবস্থায় তা হয় না।

দেখা দরকার, জেলা স্তরে হাসপাতালে বেডের সংখ্যা জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হয়েছে কি না। সেই হাসপাতালে অক্সিজেনের ব্যবস্থা প্রয়োজন অনুযায়ী আছে কি না। থাকছে না বলেই মানুষ আতঙ্কিত হচ্ছেন, চিকিৎসার আশায় শহরের বড়ো হাসপাতালে ছুটে আসছেন এবং বেড পাচ্ছেন না, কোনও চিকিৎসা পাচ্ছেন না। দেখা দরকার যে, স্থানীয় স্তরে, গ্রামাঞ্চলে এমন হাসপাতাল আছে কি না, যেখানে ওষুধ রয়েছে, চিকিৎসা পরিকাঠামো রয়েছে। সেখানে ন্যূনতম শুশ্রূষার বন্দোবস্ত আছে কি না। আক্রান্তদের

দেখভাল করার উপযুক্ত কাঠামো আছে কি না। আক্রান্তরা সঠিক পরামর্শ পাচ্ছেন কি না। কেরালার মতো যে-যে রাজ্য মৃত্যু কমিয়ে আনতে পেরেছে, তাদের এই প্রাথমিক স্তর থেকে স্বাস্থ্যকাঠামো মজবুত।

আন্তর্জাতিক স্তরে মান্য একটি সমীক্ষা বলছে, প্রতি দশ লক্ষ জনসংখ্যার জন্য ছয় হাজার নার্স থাকলে সবাই সংক্রামিত হলেও মৃত্যু ২০-৩০ ছাড়ায় না। আবার নার্সের সংখ্যা তিন হাজারে নামিয়ে দিলে মৃত্যু চার গুণ বেড়ে যায়। বহু মানুষের প্রাণ বেঁচে যায় এই নার্সিং পরিষেবা পর্যাপ্ত হলে। প্রাথমিক স্তর থেকে ধাপে ধাপে নার্স, প্যারামেডিকস্ কতজন রয়েছেন, তার ওপর নির্ভর করে প্রস্তুতি। এই বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করা দরকার গ্রামে, স্থানীয় স্তরে। পাঁচতারা হাসপাতাল মহামারি মোকাবিলায় সমাধান নয়। কোভিড সেটা স্পষ্ট করেছে।

রোগের ধরন বিচার করলে দেখা যাবে, সংক্রামিত ১০০ জনের মধ্যে ৮০ জন সুস্থ হয়েছে নিজে থেকেই। ১৫ জনের অল্পবিস্তর চিকিৎসার প্রয়োজন হয়েছে। বাকি ৫ জনকে হাসপাতালে নিতে হয়েছে। ১ বা ২ জনের আইসিইউ ব্যবস্থার প্রয়োজন পড়েছে। এখানে বলা দরকার সুস্থ ঘোষণার পরেও কারও কারও সংক্রমণ হয়েছে। তাকে 'রিইনফেকশন' বলা যাবে কি না, নির্ভর করবে পরীক্ষার ওপর। দ্বিতীয়বার সংক্রমণ ভিন্ন প্রকরণ বা স্ট্রেনের জন্য হলে পুনরায় সংক্রামিত বলা যায়। না হলে বিষয়টি 'ল্যাটেন্ট ইনফেকশন'। সুস্থ ঘোষণার সময়েও রোগীর দেহে ভাইরাস ছিল সুপ্ত অবস্থায়। কিছু পরে তা আবার উপসর্গ তৈরি করেছে। সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় প্রস্তুতি থাকলে ও পরিকাঠামো থাকলে প্রাণহানি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারা যেত।

পরিচর্যা, পরামর্শ, শুশ্রূষার আশ্বাস না থাকায় ছড়াল আতঙ্ক। বাবার কাছে ছেলে যাচ্ছে না। পাশের বাড়ির লোক দূরে সরে যাচ্ছে। বড়ো হাসপাতালে ছোটার হিড়িক পড়ছে। আমি বলব যে, এই কথা মনে রাখা দরকার, শরীরের আত্মরক্ষার যে অস্ত্র, যে আগুন রয়েছে আগে বলেছি, তা হল সাইটোকাইন। তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার। দেখা যাচ্ছে, ভাইরাস নয়, সাইটোকাইন-এর অনিয়ন্ত্রিত ঝড়ের কারণে মৃত্যু ঘটছে। 'অটোইমিউন সিনড্রোম' আমাদের অপরিচিত নয়। ছোটো আগুন লাগলে বাড়ির ব্যবস্থাপনায় নিভিয়ে দেওয়া যায়। আগুন বেড়ে গেলে দমকল ডাকতে হয়। স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সঠিক পরিচর্যা ও নিয়মিত নজর রাখলে যে কুড়ি শতাংশ ক্ষেত্রে আগুন জ্বলে ওঠে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই নিয়মিত নজরদারি বা মনিটরিং না থাকলে হাসপাতালে নিতে দেরি হয়, তখন সারিয়ে তোলা কঠিন হয়।

বাড়িতে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ? এ কথা বলব যে, বাড়িতে রেখে পরিচর্যা বেশি দরকার। কিন্তু তার সঠিক পদ্ধতি কী? বাড়িতে আক্রান্তদের দিনে চারবার করে মাপা দরকার রক্তে শর্করা, রক্তচাপ, শরীরের তাপমাত্রা এবং অক্সিজেনের মাত্রা। গ্লুকোমিটার, থার্মোমিটার, পালস্ অক্সিমিটার, প্রেসার মাপার যন্ত্র রাখা দরকার। জ্বর, পাতলা পায়খানা,